বাবরের প্রার্থনা

—*শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-)*

■ **উৎস :** 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটি 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের পনেরো সংখ্যক কবিতা। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার নাম হল 'ধ্বংস কারো ধ্বজা' এবং শেষ কবিতার নাম হল 'নচিকেতা'। 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থে মোট সাতচল্লিশটি নাতিদীর্ঘ গীতিকবিতা আছে। কাব্যগ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম 'মণিকর্ণিকা', মধ্য অংশের নাম 'খড়' এবং শেষ অংশের নাম 'হতেম তাই'। 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটি 'মণিকর্ণিকা' অংশের শেষ কবিতা। কাব্যটি প্রকাশ করেছে দে'জ পাবলিশিং। কাব্যটি কবি উৎসর্গ করেছেন 'রূপ-রূপা-রূপমকে, জন্মদিনে'।

কবিতাটি আবুল ফজলের বর্ণিত বাবরের শেষ জীবনের কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

বিষয়বস্তু

■ কবিতাটি উত্তম পুরুষের বাবরের আত্মকথনে রচিত। কবিতাটিতে আছে ছটি স্তবক এবং চব্বিশটি পঙ্‌ক্তি। প্রথম স্তবকে বলেছেন, শীত চলে গেছে—বসন্তের হাত এখন শূন্য। সম্রাট বাবর পশ্চিম দিকে মুখ করে জানু পেতে বসেছেন। আল্লার কাছে তিনি প্রার্থনা জানাচ্ছেন তাঁর অসুস্থ পুত্র যেন সুস্থ হয়ে ওঠে—আর তার বিনিময়ে আল্লা যদি সম্রাট বাবরকে চান তো সম্রাট তাহলে প্রস্তুত আছেন মৃত্যুর জন্য। তিনি তাঁর জীবনের বিনিময়ে পুত্রের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে চান।

দ্বিতীয় স্তবকে বলেছেন, পুত্রের সেদিনের স্বচ্ছ যৌবন আজ রোগে জর্জরিত—গোপন ক্ষয় তার জীবনকে কুরে কুরে খাচ্ছে। চোখের কোণে তার পরাজয়ের গ্লানি ফুসফুস-ধমনি-শিরা, সব রোগে কাবু হয়ে পড়েছে। হুমায়ুনের মৃত্যু যেন অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় স্তবকে বাবর বলেছেন, ধূসর শূন্যের আজান গানে মুখরিত করে তুলতে হবে সমস্ত শহরকে। সেই আজান গান শুনতে শুনতে তিনি পাথর হয়ে যেতে চান। তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হবেন—আর বেঁচে থাকবে তাঁর সন্ততির স্বপ্ন। তাঁর জীবনের বিনিময়ে আল্লার কাছে বাবর হুমায়ুনের জীবন ভিক্ষা চান।

চতুর্থ স্তবকে পাপবোধের কথা এসেছে। রক্তসূত্রে একজনের পাপ অন্যজন বহন করে নিয়ে চলে, এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে। একজনের পাপে অন্যজনের পতন ঘটে। পাপের জীবাণু যেন সংক্রমণের মতন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গ্রাস করে। বর্বর জয়ের উল্লাসে বাবর একদিন কত নিরীহ মানুষকে খুন করেছেন, কত রক্তের হোলি খেলেছেন। সেদিনের রক্ত আঁখির নিষ্ঠুরতায় যে পাপ করেছেন বাবর, সেই পাপই পুত্র হুমায়ুনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। অপরের মৃত্যু আজ নিজের ঘরে মৃত্যু ডেকে এনেছে। বিধাতার কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

পঞ্চম স্তবকে বলেছেন, রাজপ্রাসাদে বিজয় উল্লাসের সময় আলোর রোশনায়ে কত পতঙ্গ পুড়ে মরে, ভোগ সুখের মত্ততায় সাধারণ মানুষের কত সর্বনাশ হয় কত চোখের জল পড়ে। সেই সর্বনাশ আর চোখের জল ভবিষ্যতে মৃত্যুর বিভীষিকা ডেকে আনে।

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠ স্তবকে বাবরের ট্র্যাজেডির কথাই ঘোষিত হয়েছে। আল্লা বাবরকে ধন, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, রাজ্য জয়ের ঐশ্বর্য সম্ভার দিয়েছেন—কিন্তু তার বিনিময়ে একমাত্র পুত্র হুমায়ুনকে মৃত্যু যন্ত্রণার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। বাবরের সম্রাট সত্তা হার মেনেছে আজ পুত্র সত্তার কাছে। তিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চেয়েছেন। ভবিষ্যৎকে তিনি রক্ষা করতে চেয়েছেন অতীতের বিনিময়ে।

রসগ্রাহী আলোচনা/তাৎপর্য বিশ্লেষণ

■ বসুধা মুখোপাধ্যায় 'একালের কবিতা : পাঠকের দর্পণে' গ্রন্থে লিখেছেন—"কবিতার মুহূর্ত' গ্রন্থে শঙ্খ ঘোষ 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতা লেখার উৎস ও প্রেরণা রূপে তাঁর বড়ো মেয়ের অসুস্থতার কথা বলেছেন। যে অসুখ ক্রমে সেই সময়ের সংঘাত, অশান্তির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে বলে তাঁর মনে হয়। প্রার্থিত সুদিন, সুস্থতা কোথাও নেই ; অথচ 'কিছু একটা হবার কথা ছিল, অন্তত কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল', তাঁর মনে হয়। তারপরই ব্যক্তিগত দুঃখ, আর্তি মিশে যায় অসুস্থ দেশ-কাল-সমাজের মঙ্গলের জন্য। কবি জানান, 'যেন সমস্ত শরীর ভরে উৎসারিত হয়ে উঠতে চায় অন্তর থেকে কোনো প্রার্থনা, সকলের জন্য।' নামাজ পড়ার ছবি আর বাবরের পিতৃস্নেহ মিলে রচিত হয় এই প্রার্থনা-ভালোবাসার প্রার্থনা। পড়তে পড়তে পাঠকের মনে অসম্ভব এক বেদনা আর আত্মসমর্পণের আনন্দ সঞ্চারিত হয়ে যায়। আত্মত্রাণের বদলে সকলের জন্য মুক্তি কাম্য হয়ে ওঠে। জগৎ স্রষ্টার কাছে নম্র, নত হয়ে বিবেকবান প্রতিটি মানুষ হাঁটু গেড়ে একটি প্রার্থনা জানায়—'আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"

ইতিহাসের কাহিনিকে আধুনিক পাঠকের মননের উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন শঙ্খ। অতীতের অন্ধকার জগৎ থেকে হারানো গৌরবকে তুলে আনা আধুনিকতার একটা অন্যতম লক্ষণ। শঙ্খ আলোচ্য কবিতায় ইতিহাসের ঘটনা বহুল কর্মকাণ্ডের ভিতর থেকে মানবমনের অন্তর্নিহিত ভাবসত্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন। শঙ্খ কবি—ইতিহাস রচনা বা ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ তাঁর লক্ষ্য নয়। শঙ্খর লক্ষ্য হল চিরকালীন মানবমনের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রস্ফুটিত করে দেওয়া, কবি তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে ইতিহাসের মর্মলোকে প্রবেশ করে মানবমনের চিরন্তনী আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছেন। ইতিহাস যে শুধুমাত্র রাজশক্তির উত্থান-পতন যুদ্ধ আর সিংহাসন দখলের লড়াই মাত্র নয়, তা যে মানবহৃদয়ের আবেগ অনুভূতির প্রকাশ, এই সত্য তিনি অনুভব করেছিলেন বলেই 'বাবরের প্রার্থনা'র মতন কবিতা লিখতে পেরেছেন। ইতিহাস এখানে অতীতের নয়—ভবিষ্যতের কথা বলে উঠেছে। 'কথা ও কাহিনি'-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> 'তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
> অদৃশ্য লিপি দিয়া
> পিতামহদের কাহিনি লিখিছ
> মজ্জায় মিশাইয়া।
> যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
> তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
> বিস্মৃত যত নীরব কাহিনি
> স্তম্ভিত হয়ে রও।
> ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত
> কথা কও কথা কও।

ইতিহাসের কোথায় কল্পনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র লেখায় বুঝিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'সমাকল ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে।' 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
> ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
> রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

রবীন্দ্রনাথের জগৎ থেকে শঙ্খ ঘোষ বহু যোজন দূরে অবস্থান করছেন। রবীন্দ্রনাথ উনিশ ও বিশ এই দুই শতাব্দীকে স্পর্শ করে আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে উপলব্ধি করেছেন, শঙ্খ ঘোষ বিশ ও একবিংশ এই দুই শতাব্দীকে স্পর্শ করলেও মূলত বিশ শতাব্দীর সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বীর যোদ্ধা সম্রাট বাবর এখানে বড়ো হননি। বড়ো হয়েছে একজন দীন সন্তপ্ত পিতা—যে রোগ জীর্ণ পুত্রের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনারত। পিতা বাবর এখানে অকপটে স্বীকার করেছেন নিজের পাপের কথা। নিজের মৃত্যুর বিনিময়ে তিনি পুত্রের জীবন ভিক্ষা করেছেন। বাবর এখানে কেবল অতীত ভারতের সম্রাট, শুধু হুমায়ুনের পিতা হয়ে থাকেননি—তিনি মানবজীবনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বাবর সমগ্র মানবের চিরকালের তপস্যা ও সত্যানুভূতির সঙ্গে সম্পৃক্ত লাভ করেছেন। তিনি বলেছেন—

> 'এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
> আজ বসন্তের শূন্য হাত—
> ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
> আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।'

(১ম–৪র্থ স্তবক)

কবিতাটি শঙ্খ ঘোষ লেখেন ১৯৭৪ সালে। সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় অনেক ইতিহাস আশ্রয়ী কবিতা লেখা হয়েছে। সমকালে পূর্ণেন্দু পত্রী লিখেছেন—

> 'বহুদিন একভাবে শুয়ে আছো ভারত সম্রাট
> দেওয়ানি খাসের ধুলো, ভারতের যতটুকু সাম্প্রতিক ইতিহাস জানে
> তুমি তার সামান্য জানো না, আছো স্বস্তিতে ও ভয়ে।
> আওরঙ্গজেবের ঘোড়া মারা গেছে
> এবং সে নিয়ে, কেউ বলেনি তোমাকে ?
> সবচেয়ে দুর্ধর্ষতম বীরত্বের ঘাড়ে একদিন মৃত্যুর থাবড় পড়ে
> সবচেয়ে রক্তপায়ী তলোয়ারও ভেঙে যাচ্ছে দেখে
> এই সত্য কথাটুকু কোন মেঘ, কোন বৃষ্টি, কোন নীল নক্ষত্রের আলো
> তোমাকে বলে নি বুঝি ? তাই আছো স্বস্তিতে ও ভয়ে,
> শব্দহীন গাঢ় ঘুমে, প্রিয়তমা পাশে শুয়ে, ভুলে গেছে সেও সঙ্গীহীন
> তারও চোখে নিদ্রা নেই, এখনো মর্মান্তিক স্নানে
> তুমি বন্দি পুত্রের শিকলে।

রাজনৈতিক অস্থিরতার এ আর এক মুখ। নতুন আকাঙ্ক্ষার মুখ উঁকি দিয়েছে এখানে। আবার আতঙ্কের ছায়াও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। তথাপি সময় পরিবর্তনশীল। রাজা বদল হয়। শিকল ছিঁড়ে যায়। রাজনৈতিক বোধ অপেক্ষা মানবিক বোধ তখন বড়ো হয়ে ওঠে। শঙ্খ ঘোষ বাবরের মুখে যে কথাগুলো বসিয়েছেন—তা সমকালের অনেক বাবরেরই কথা—

'কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়!
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনি শিরা!
* * * *
জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক!' (৫ম—১২তম চরণ)

বাবরের মতন কবি শঙ্খ ঘোষও নিজের কন্যার অসুস্থতায় ঈশ্বরের কাছে একই হয়তো প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সম্রাট বাবর নয়—চিরকালের পিতা বাবরই এখানে বড়ো হয়ে উঠেছে। সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "যে-কোনো পিতার, সমাজমনস্ক যে-কোনো মানুষের প্রতিরূপ হিসাবে বাবরকে গ্রহণ করা যায়। সন্তান নয়, সন্ততির উল্লেখে ব্যাপ্তির সীমা, দেশকালের গণ্ডি যেন ভেঙে গেছে। চারিদিকে এত খুন, ভাঙন, দুর্নীতি, পাপ ও অন্যায় দেখে আমরা ভীত, শিহরিত হয়ে ভাবি, আমাদের সন্তানকে এ কোন্ পৃথিবীতে রেখে যাচ্ছি? পরিত্রাণের পথ কী? শুধু নিজেকে নিঃশেষে দান করলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? যদি সমাজ, সংসার দেশ ও মানুষ পরিবর্তিত না হয়, শুভবোধ জাগ্রত না হয়, তবে পরিণাম কী? এত প্রশ্ন সংশয় সত্ত্বেও আমরা কিন্তু চাই সন্তানের মঙ্গল; চাই আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক! যে কালে 'বাবরের প্রার্থনা' লেখা হচ্ছে সেকালে 'আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক' ভাবটা খুব শক্ত ছিল। দেশময় তখন অস্থিরতা। সেই অস্থিরতার জন্য আমাদের ভুলই তো দায়ী। ভোগের নেশায় উন্মাদ হয়ে অসুররা আমাদের উত্তর প্রজন্মকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এ কবিতার হুমায়ুন সেই উত্তর প্রজন্মের প্রতীক। বাবর এখানে দেশনেতার নতুন প্রতীক হয়ে এসেছে—অতীত এখানে বাক্যহীন। মধ্যযুগের চিত্রায় সমকালীন রক্তক্ষয়ী বর্বর রাজনীতির ছবিই ভেসে ওঠে। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন—

'নাকি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?' (১৩তম—১৬তম চরণ)

বাবর আত্মসমীক্ষা করেছে। পুত্রের অসুস্থতার জন্য নিজের পাপকে দায়ী করেছে। তাঁর যুদ্ধের জয়ের উল্লাসের মধ্যে পাপ শনি হয়ে প্রবেশ করেছে। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য অনেক খুন, লুঠতরাজ, ধ্বংসের নৃশংস অমানবিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়েছেন। মারা গেছে নিরপরাধ কত মানুষ। সেই পাপেই আজ তার এই করুণ অবস্থা। তার পাপই ভবিষ্যৎ বংশধরকে মৃত্যুপথ যাত্রী করে তুলেছে। সমালোচক লিখেছেন, 'মানুষের শরীরে আজ জন্ম-পাপের জীবাণু; এই জীবাণুর সংক্রমণে জন্ম জন্ম ধরে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আক্রান্ত হয়—নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে

ভবিষ্যতের পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। যে বর্বর জয়ের উল্লাস বর্তমান কাল অভিনন্দিত, সেই জয়ের উল্লাসই অনাগতকালে মৃত্যুর শোচনীয় পরিণতি ডেকে আনে। বিক্রমের নিষ্ঠুরতায় রক্তপথ দিয়ে যে পাপ প্রবেশ করে, সেই পাপই ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। এই তো মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুর ট্রাজেডি।

তাই দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় —

'নাকি এ প্রাসাদের আলোর ঝলসানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের?' (১৭তম—২০তম চরণ)

ঐশ্বর্য কখনও সুখ ও শান্তির ঠিকানা হতে পারে না। 'বর্বর জয়ের উল্লাস', 'প্রাসাদের আলোর ঝলসানি'র কথা ভেবে, সম্রাট আজ অনুতপ্ত হয়েছেন, আতঙ্কিত হয়েছেন। সম্রাটের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ভোগ ঐশ্বর্যই পুত্রকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে—'পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়'। সমালোচক লিখেছেন—'ঐশ্বর্য সুখ না শান্তি দেয় না; অসীম সম্পদের মাঝে তাই নিরন্ত বেদনা কাঁদে। সম্পদ সঞ্চয়ের মূলে আছে অন্যকে বঞ্চিত করা। দরিদ্রকে না মেরে ধনীর জন্ম হয় না। মার্ক্সীয় এই অর্থনীতির তত্ত্ব সত্য। সেইসব বঞ্চিত, ক্ষুব্ধ, অসহায় মানুষদের কান্না ও দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ হয় না। তাই 'সোনার মুকুট কত টুটে যায়'। বাবর জানেন, তাঁর প্রাসাদের বৈভবও সৎকর্মের সঞ্চয় নয়। তা তাঁকে হৃদয়হীন করেছে। তাই হত্যা, লুণ্ঠন সম্ভব হয়েছে। আজ অসুস্থ সন্তানের জন্য কৃতকর্মের শোচনায় হাড় পর্যন্ত দগ্ধ হয়। যন্ত্রণার্ত সন্তানের শরীরের গ্লানি যেন বাবর নিজের শরীরেও অনুভব করেন 'লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের দংশন'। স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা এই সময়ের কবিদের কাছে অন্যভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সময়কে ফুটিয়ে তুলতে তাঁরা ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন। দিনেশ দাশ 'মমতাজ' কবিতায় লিখেছেন—

'মমতা-মোমে গলানো মমতাজ
তোমাকে খুঁজি আজ
একটি কথা তোমার শুধালেম
যেখানে আছে প্রেম?
নীল-যমুনা করেছে চুরি যে কোন্ বঞ্চক
রাঙিয়ে দিল তোমার নীল চোখ।
হৃদয়ে জ্বলে পূরবী-ভৈরবী
ঠোঁটে কি জ্বলে অস্তগত রবি,
সাপের মতো ফুলে বায়ু হাওয়ার সমুদ্দুরে
সাঁতার কেটে চলে কি বহুদূরে—
যেখানে ছিল প্রেম?
আজকে শুধালেম?'

'মমতাজ' এখানে এক বঞ্চিতা নারীর মুখ হয়ে ফুটে উঠেছে। বঞ্চিতা নারীর হৃদয়ের ব্যথাই কবির আলোচ্য বিষয় হয়েছে। 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যের 'কলযমুনা' কবিতাতেও একই ভাব

ফুটে উঠেছে। সমকালে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র 'রাজধানীর কবিতা, ১৯৭১'-তে লিখেছেন—

'শাজাহান আলমগীর বাহাদুর শাহেরাও
দেখে গেছে সব—
হাতির পায়ের তলে অপরাধী পেষা।
ঘাম আর গায়ের রক্ত জল ক'রে ক'রে
গড়ে তোলে সাধারণ লোক,
ভাস্কর, কামার
নিষ্ঠুর, কামার
নিষ্ঠুর প্রতিমা সব
প্রাসাদ মঞ্চিল।

সামাজিক প্রয়োজনেই ইতিহাস এখানে কথা বলে উঠেছে। ইতিহাস দিয়েছে নতুন পাঠের ইঙ্গিত। বাস্তবতার যাথার্থকারকে ইতিহাস ভাষা দিয়েছে। ইতিহাস সামাজিক সমস্যা ও চিন্তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির বহুদিককে অনুসন্ধান করেছে। আগামী প্রজন্মের কথা, ভবিষ্যতের কথা বলেছে—

'আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বস্থে থাক। (২১তম—২৪তম চরণ)

পৃথিবীর গভীর অসুখের মধ্যে সন্তানের সুস্বাস্থ্যই পিতা আকাঙ্ক্ষা করেছেন। পরিপূর্ণ সুস্থ মানবসমাজ তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান না। কেননা বর্তমান 'বিরূপ বিশ্বে নিয়ত একাকী' (সুধীন্দ্রনাথ) মানুষ নিজের সঙ্গে নিজেই যুদ্ধ করে চলেছে অবিরত। মানুষের মনের ভিতর এখন 'নির্বোধের মরুভূমি', 'জীবনের মরুদ্যান'। জীবনানন্দ লিখেছেন—

'এযুগে কোথাও কোনো আলো, কোনো ক্লান্তিময় আলো
চোখের সম্মুখে নেই মাত্রিকের,
নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার, রাত্রির মায়ার মতো। (১৯৪৬-৪৭)

এই মর্মান্তিক সামাজিক প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে বাবরের প্রার্থনা। ইতিহাসের পিতার নিজের দেহে পুত্রের অসুস্থতা গ্রহণ করার মধ্যেই এ কবিতার গল্প শেষ হয়নি। একটা সামাজিক আকাঙ্ক্ষার সার্বজনীন রূপই ছড়িয়ে পড়েছে। পিতার অস্থির চিত্তের প্রার্থনাই বুঝিয়ে দিয়েছে সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র। 'কবিতা ইতিহাস আবহ' প্রবন্ধে নবেন্দু সেন লিখেছেন, 'এ ইতিহাস তো সে ইতিহাস নয়। এ প্রার্থনা তো সে প্রার্থনা নয়। সামাজিক অসুস্থতার পঙ্গু যুবশক্তির আরোগ্য কামনায় কবির উচ্চারণ। অতীত নয়, বর্তমান। কিন্তু পাঠকের মনে অতীতের চিত্রটির উদ্ভাসনও মিথ্যা নয়। মনে হতে পারে ইতিহাস কেবল একটি আবহ সৃষ্টি করে যাচ্ছে তার বেশি নয়। কোনো মায়াবী রোমান্টিকতা নেই, অথচ কঠিন সামাজিক সত্যের প্রতীতী অনাহত। নতুন করে পুরাতনকে ইতিহাসায়িত করার নির্মোহ দৃষ্টি। এইজন্যই নব্য ইতিহাসবাদীরা মনে করেছেন 'There is nothing like real historical approach' ;সাহিত্য সমালোচনায় উত্তর-আধুনিকতার এই নির্মোহ নতুন সৃষ্টি নতুনভাবে পাঠককে ভাবাচ্ছে, উদ্বোধিত করছে মুক্ত চিন্তাধারায়। যে অতীত ভুবন জুড়ে গোপনে গোপনে কাজ করে যেত, কবির দৃষ্টিতে আজ তা নির্মোকমুক্ত একটি

যেতে পারি কিন্তু কেন যাব ?

—শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫)

১ ■ উৎস : কবিতাটি 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব ?' (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা।

বিষয়বস্তু

■ জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কবি এখন জীবনের দিকে ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো বলে মনে করছেন।

ময়লা আবর্জনার দুঃসহ অন্ধকারে বাস করতে করতে কবি চারপাশের সবকিছুই অন্ধকার দেখছিলেন এতদিন। তাই প্রিয়জনকে তখন আর কাছের জন বলে মনে হচ্ছিল না।

কিন্তু এখন সেদিন অতিক্রান্ত। এখন স্বপ্নে খাদের পাশে রাত্তিরে কবি একা-একা দাঁড়ান। শুনতে পান জীবনরূপী চাঁদের মায়াভরা কণ্ঠস্বর। আবার ঘুমের স্বপ্নে গঙ্গার তীরে দাঁড়ালে শুনতে পান, মৃত্যুরূপী চিতাকাঠের কণ্ঠস্বর।

জীবন আর মৃত্যু কবিকে নিয়ে খেলা করে। কবি যেতে পারেন, জীবন ও মৃত্যুর যে-কোনো দিকেই চলে যেতে পারেন। কিন্তু কেন যাবেন ? কোনদিকেই বা যাবেন। সংগ্রাম করেই কবি বেঁচে থাকবেন। সন্তানের মুখে ভালোবাসার আয়না এঁকে একটি চুমু খাবেন।

তারপর ? .....

চলে যাবেন। কবি জানেন, পৃথিবীতে চিরকাল কেউ বেঁচে থাকবে না। কিন্তু এখনই তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চান না। পরিচিত জনদের সঙ্গে নিয়েই পৃথিবী ছেড়ে যাবেন। একাকী, এই অসময়ে তিনি যাবেন না। ভয়ে বা ক্লান্তিতে অথবা দুঃখে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষ নিয়ে, একাকী তিনি চলে যেতে চান না।....

অবক্ষয়িত সমাজের ক্লেদ ও গ্লানিমা

■ বর্তমানে পৃথিবীর অবক্ষয়ের চিত্র জীবনানন্দের একটি কবিতায় সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে—

'গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত
আমাকে কেন জাগাতে চাও ? .....
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়-বেদনায়-আক্রোশে ভরে গিয়েছে
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন
কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।'

সমাজ জীবনের অবক্ষয় আর অন্ধকারের স্তব্ধতায় জীবনানন্দের কবি হৃদয় রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণার শিকার হয়েছে—

'মানুষের লালসার শেষ নেই
উত্তেজনা ছাড়া কোনোদিন ঋতুক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ

অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই। কেবলই আসন থেকে বড়ো,
নবতর সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কোনো।
মানুষের দুঃখ কষ্ট মিথ্যা নিষ্ফলতা বেড়ে যায়।

প্রতিমুহূর্তে মনে হয়—

'এ পৃথিবীর সুর স্বপ্ন সুখশ্বাস
কবিতা-বিবমিষা-মৃত্যু নিয়ে যেমন প্রথম
কাপালিকার কল্লোল সংগীতে .... নরক
শ্মশান হ'ল সব।'

আলবেয়ার কামুর 'The outsider' উপন্যাসের নিঃসঙ্গ নায়ক মারসো সুখ-দুঃখ ভালোবাসার জীবন থেকে নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তার মনে হয়েছিল, 'We and things in general exist and that is all there is this absurd business called life.' এই ক্লান্তি, বিষাদ, বোধের ক্রন্দন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও শুনেছেন, মাঝে-মাঝে জীবনানন্দ তাঁর কাছেও মারাত্মক যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা বহন করে এনেছে। জীবনানন্দের মতো তাঁরও তখন মনে হয়েছে পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ' এখন। মনিব অস্তিত্বের গভীর সংকটের নিরন্ন উপলব্ধি, নিরর্থকতা, সংশয়, জিজ্ঞাসা অপরিসীম ক্লান্তি বহন করে এনেছে। যেমন আর ক্লান্তির বিপরীতে কবি তখন সারাক্ষণ হয়েছেন তার অন্তরাসত্তার কাছেই। জৈবাসনা, তড়িত দৈহিক অস্তিত্বরক্ষার জীবন সংগ্রামে কবি ক্লান্ত। সেই ক্লান্তি আর বিপন্নতার সীমা পেরিয়ে কবি যে জগত দেখেছেন তা সংশয় ও হতাশার জগৎ। কবি মনে করেন, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, আর সন্তানের জন্ম দেওয়াই মানব জীবনের শেষ কথা হতে পারে না। জীবনানন্দ 'বোধ' কবিতায় বলেছেন—

'তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় নাকি ? তাহাদের মন
আমার মনের মতো নাকি ?
—তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এমন একাকী ?

শক্তিও নিজেকে তখন একাকী, বোধ করেছেন। ভালোবাসা অবহেলা ঘৃণা সব তখন একইরকম হয়ে যায়—'এ জীবন ধীরে ধীরে বীতশোক হয়।' তখন নারীর দৈহিক আবেদন, শারীরিক আকর্ষণ, প্রিয়জনের ভালোবাসা, কোনো কিছুর মূল্য থাকে না। তখন প্রেম-ভালোবাসা পঙ্কিল ও কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। শক্তি বলেছেন—

এত কালো মেখেছি দু হাতে
এত কাল ধরে।
কখনো তোমার ক'রে, তোমাকে ভাবি নি।

তখন কবি প্রিয়জনকেও চিনতে পারেন নি। আত্মকেন্দ্রিকতা, বিচ্ছিন্নতা, অসম্পূর্ণতার বাইরে কবি জীবনকে দেখতে পান নি। এক দুর্জ্ঞেয় জীবনতৃষ্ণা, অভাববোধের বেদনা, আর অস্তিত্বের সংকট কবিকে তখন তাড়া করেছে। শক্তি জোনাকি-এর মতো কবিও তখন 'alone'। তাই 'মৃত্যু' না 'জীবন', কোনটি নিকট আত্মীয়, কবি তা বুঝে উঠতে পারেন নি তখন। সে জন্য

নির্জনে রাত্রে খাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে জীবনের মায়াকে অনুভব করেন, আর ঘুম থেকে উঠে রাত্রে একাকী গঙ্গার তীরে গিয়ে দাঁড়ালে মৃত্যুর ডাক শোনেন—

'এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে ঃ আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে ঃ আয় আয়।'

'চাঁদ' হল জীবনের প্রতীক, আর 'চিতাকাঠ' হল মৃত্যুর প্রতীক। প্রেম কবির কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু সেই প্রেম প্রায়ই দূরে থাকে। পৃথিবী ক্রমশই ডুবে যাচ্ছে ঘোর অন্ধকারে। চতুর্দিকে অরাজকতা। সামনে সমূহ বিপদ। 'ক্লান্তি দুঃস্বপ্ন'র থাবা কবির হৃদয়কে গ্রাস করে। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কোন্‌টি মোহনীয়, কবি তখন তা বুঝে উঠতে পারেন না। ক্লান্ত কবি রবীন্দ্রনাথকেও একসময় উচ্চারণ করতে শুনেছি—

'ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন—
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,—
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অজ্ঞান
ঊষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির আঁকা
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।।' (দুঃসময়)

আধুনিক যুগে মানুষের বেঁচে থাকা নিরঙ্কুশ আনন্দের নয়। খণ্ড খণ্ড মৃত্যু, ব্যর্থতা ও অন্ধকার নিয়ে বর্তমান যুগের মানুষের বেঁচে থাকা। এই অপচয় প্রতিমুহূর্তে মানুষের আত্মাকে ক্লান্ত করে। এই ক্লান্তি দেখে জীবনানন্দর মতো কবি শক্তিও মানুষ অপেক্ষা পশুপাখির জীবনকে মহত্তর বলেছেন—

মানুষের অপেক্ষা পশুপাখির জীবন মহত্তর

'মানুষ যেভাবে কাঁদে, তেমনি কি কাঁদে পশু পাখি ?
একা থাকি, বড়ো একা থাকি।
ভিতরে একা, অরণ্যের মধ্যিখানে একা
ঘর ও বাহিরে একা।' ('মানুষ যেভাবে কাঁদে')

একা থাকা কবিকে তখন দিনের ব্যস্ততা নয়, রাতের নির্জনতাই ডাকে—

'জলের ধারে কেবলি হল জলের খেলা
অবর্তমানে তোমার হাসি ঝাউয়ের ফাঁকে
আমায় গভীর রাত্রি ডাকে
ও নিরূপম্ ও নিরূপম্ ও নিরূপম্।' (ঝাউয়ের ফাঁকে)

ছকে বাঁধা মধ্যবিত্তের জীবনে বৈচিত্র্য নেই। তারা সব শূন্যগর্ভ মানুষ। এলিয়ট বলেছেন—

'We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless.' (The Hollow Men)

Scanned with CamScanner

এই শূন্যগর্ভ মানুষের প্রতিনিধি কবি—যাঁকে আধুনিক কৃত্রিম জীবন গ্রাস করে ফেলেছে। যুগ বিপর্যয়ের আর্তনাদে কবির অন্তরাত্মা তাই রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। কবির অন্তরাত্মা হয়েছে ক্লান্ত—

'দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো ?' ('অবনী বাড়ি আছো ?')

জীবনানন্দ বলেছেন—

'ধান সিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব ধীরে-পউষের রাতে—
কোনোদিন জাগবো না জেনে—
কোনোদিন জাগবো না জেনে—
কোনোদিন জাগবো না আমি-কোনোদিন আর।' (অন্ধকার)

শক্তি তখনও ভেবে উঠতে পারেন নি, জাগরণ না ঘুম ? তথাপি পৃথিবীর প্রতি প্রেমকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। তাই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু অপেক্ষা জীবন বড়ো হয়েছে।

Scanned with CamScanner

চলে যেতে চান না। পরিচিতজনদের সঙ্গে নিয়েই পৃথিবী ছেড়ে যাবেন। একাকী, এই অনন্তে তিনি যাবেন না। তবে যা রয়েছিতে অথবা দুঃখে, বিচ্ছিন্নতাবোধের বিষ নিয়ে, একাকী তিনি চলে যেতে চান না। কবি জানেন চিরে পড়েছে ঠিক যেমনভাবে আকৃষ্ট হয়, সংসারও তেমনভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করে। তবু সংসার ছেড়ে যাবার ক্ষমতা কবির নেই। এমন অবস্থা সব মানুষেরই হয়। সন্তানের মুখ প্রতিটি মানুষকেই শীতল ছায়াতে দাঁড়িয়ে দেয়। ব্যর্থতা নয়, নৈরাশ্য নয়, কবিতাতেই তখন হাততালি দেয়। কবিকে তখন ঘুরে দাঁড়াতেই হয়। এ ঘুরে দাঁড়ানো নিজের জন্য যতখানি, পরিবারের জন্যও ঠিক ততখানি। জীবনে আশা পূর্ণ না হলেও জীবনই তখন সবচেয়ে আদরের ধন হয়ে ওঠে। ক্লান্তি বা বিচ্ছিন্নতাবোধ নয়, ভালোবাসার কথাই তখন বড় বেশি করে মনে পড়ে।৮

আমার নাম ভারতবর্ষ

—অমিতাভ দাশগুপ্ত (১৯৩৫-২০০৭)

■ **কবি পরিচয় :** অমিতাভ একালের প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী কবিদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় কবি জানিয়েছেন, 'সাম্প্রত থেকে হাঁটতে হাঁটতে উৎসের দিকে চলে যাওয়া—এ আমার পছন্দ মাফিক।' স্বভাবতই কবি অতীত অন্বেষণ প্রয়াসী। তাঁর কবিতার একদিকে যেমন আছে গভীর জীবন প্রত্যয়, অন্যদিকে তেমন তাঁর বাক্‌ভঙ্গির ঋজুতা আমাদের মুগ্ধ করে।

■ **উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ :** অমিতাভ দাশগুপ্তর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হল 'সমুদ্র থেকে আকাশ' (১৯৫৭), 'নীল সরস্বতী', 'এসো রাত্রি, এসো হোম', 'আমার নীরবতা, আমার ভাষা' 'মৃত শিশুদের জন্য টফি' (১৯৬৪), 'খিদশ নয়, ছেঁড়া পাতা', 'এসো স্পর্শ করো', 'আমাকে সম্পূর্ণ করো নাও', 'মধ্যরাত ছুঁতে আরো সাতমাইল' (১৯৬৭), 'বধূর বালিকা', 'আমি তোমাদেরই লোক', 'আগুনের ডালপালা', 'নির্বাচিত কবিতা', 'মৃত্যুর অধিক খেলা' (১৯৮২) ইত্যাদি।

■ **কাব্য পরিচয় :** অমিতাভর কাব্য শিকড় ছড়িয়েছে জনজীবনের ক্ষেত্রে। তাঁর প্রতীকী চিত্রকল্পে সেই অনুভূতিই ধরা আছে। 'নীল সরস্বতী' কাব্যের 'আমার আকাঙ্ক্ষা শিল্প চাই' কবিতায় কবি সেকথাই বলেছেন—

> 'ছেড়ে ফেলি চাবুকগুলো। আমার আকাঙ্ক্ষা শিল্প চাই।
> মাখনের মসৃণতা নয়, চাই কর্কশ পাথর।
> মরমী উপলব্ধি আর বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার রাত্রি,

আকাশ, জল প্রভৃতি বেঁচে থাকার উপাদান তাঁর কবিতায় অনেক সময় পটভূমি রচনা করেছে, না হয় প্রতীকে পরিণত হয়েছে। 'এসো রাত্রি, এসো হোম' কাব্যের 'এসো রাত্রি' কবিতায় বলেছেন—

> 'এসো রাত্রি। এসো হোম। এসো, এসো অন্তর্যামিনী।
> পাতালনিলয় এসো, নীল নিদ্রাহীনতার এসো,
> বাসনার তোপে তোপে বারুদ সুতীব্র শরীরে,
> অথবা সন্ন্যাস নাও, নিশ্চিহ্ন অস্তের সন্ন্যাস।

তাঁর কবিতার ভাষা সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক। কবি আবার যন্ত্রণা প্রকাশ করতে গিয়ে

খিদশ নয়, ছেঁড়া পাতা' কাব্যের নাম কবিতায় বলেছেন—

> 'গত দুবছর ধরে যা-ই লিখি, পদ্য হয় না।
> অমনোনীত যে পাতাগুলো আর ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতাসে ওড়াই,
> সেগুলোর শাদা বকপাখি,
> কবিতার অপার বিস্ময়।

অমিতাভ সমকালের প্রতি দায়বদ্ধতাকে কখনও এড়াতে পারেননি। শোষণ, বঞ্চনা, প্রতিবাদের চিত্র তাই তাঁর কবিতায় বারে-বারে ঘুরে ঘুরে এসেছে। তবে এইসব চিত্র তুলে ধরেই তিনি তাঁর কাজকে শেষ করেন নি, সমকাল সমস্যাকে তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। স্বদেশের প্রতি তাঁর আছে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। 'আমার নাম ভারতবর্ষ' কবিতায় সে কথাই জানিয়েছেন কবি। ড. উজ্জ্বল ঘোষ 'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতা উৎস ও বিবর্তন' গ্রন্থে বলেছেন, "চা-বাগানে, কয়লাখনিতে, পাহাড়ে, অরণ্যে, শ্রমিক, কৃষক, মজুর-এর বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণা তাদের প্রতিবাদ, প্রতিরোধের সংগ্রামে কবি মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁর সংগ্রামের স্বরূপ, সহানুভূতির অণুবিন্দু ভালোবাসার সংবেদিতা। 'ভারতবর্ষ' নামক তাঁর স্বদেশের প্রতিটি দুঃখ, প্রতিটি যন্ত্রণা, প্রতিটি সংগ্রামে তিনি মিশে থাকেন। এ এক বিশ্বজনীন আত্মলীনতা। কবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে মানুষের সংগ্রামের মূল্য ব্যর্থ হবার নয়। জীবন অন্যরকম হবে, জেগে উঠবে সুর, রূপ, গন্ধময়তায়, জেগে উঠবে প্রাণের উৎসব। অমিতাভর অর্থের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।" পাঠক-পাঠিকাদের কবি আশাবাদীর জগতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষদের উদ্দেশে বলেছেন—

> 'কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে
> মানুষও একদিন কাঠ হয়ে যায়।' (কাঠের চেয়ার)

নিষ্প্রাণ কাঠের মতো এইসব যান্ত্রিক মানুষেরা জীবনের শুভ মুহূর্তগুলো হারিয়ে ফেলেছে। শোষণের তাঁবাকেও লিপ্ত হলেও তাদের দাগ লাগে না। পাথরের মতো অপমানের বোঝা নিয়ে পড়ে থাকা ছাড়া তাদের আর অন্য পথ থাকে না। নিষ্প্রাণ এইসব পুরুষদের নারীর শরীরও আকর্ষণ করে না, শিশুর হাসিও তাদের ভালো লাগে না। উদাসীনতার মধ্যেই তারা জীবন কাটায়, তাদের অন্তরে মন নামক বস্তুটি মরে গেছে। তাদের হৃদয়ে ভালোবাসা নেই, দুঃখ নেই, বিশ্রাম নেই, তারা শুধু আত্মকেন্দ্রিক নিষ্প্রাণ জীবনকে বয়ে বেড়িয়ে আনন্দ লাভ করে। 'কাঠের চেয়ার' কবিতাতেই বলেছেন—

> শুধু কাঠের ভেতর লোহার পেরেক গাঁথি
> তার মুখে চোখ
> বাকি জীবনভর
> খোলো চেয়ার থেকে মেঝের চেয়ার
> মেঝে চেয়ার থেকে বসে চেয়ার
> হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

এর বাইরে এইসব মানুষদের কোনো মনুষ্যত্বের জগৎ নেই। এইসব নিষ্প্রাণ মনুষ্যদের আত্মস্বার্থ মিটে গেছে। তারা অপর জগতের কল্যাণ নিয়ে মাথা ঘামায় না। এরা অনন্ত পাপ

যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, ঝড়, ভুখামিছিল দেখে। কবি দেখেছেন, খুনের উল্লাসের সন্ধ্যা। প্রেমকে ধ্বংস করে হত্যার লীলাখেলা নারীর হৃদয়কে ধ্বংস করে পাশবিক প্রবৃত্তি। দারিদ্র্য আর বঞ্চনা নিয়ে নারী শুধু পুরুষের দাসী হয়েই বেঁচে থাকে। 'নারীমেধ' কবিতায় আছে সেই নারী শোষণের ভয়ংকর চিত্র—

'গাঁ থেকে এসেছে চাষার ঝিয়ারি
ফুটপাতে পাল পাল
জানে না কোথায় কার পাশে শুলে
হাতভরে মেলে চাল।'

পেটের ক্ষুধা মেটাতে এই সমাজে পিতাকে বিক্রি করতে হয় তার কন্যাকে। নকশাল আন্দোলনের দিনগুলোর স্মৃতি উঠে এসেছে অভিজ্ঞতা থেকে। 'শাঁখাভাঙা হাত' কবিতায় বলেছেন—

'যেভাবে পলতে থেকে আগুন বারুদে ছোটে,
প্রাণ থেকে প্রাণে
ঈশানী বাংলার গান-মিলেছি মায়ের ডাকে সবে,
সাতকোটি জয়সিংহ হেঁকে ওঠে—
কত নৃমুণ্ডের ফুল চাও রক্তজবা,
মা, তোমার শাঁখাভাঙা হাতদুটি কী দিয়ে সাজাবো?'

কত তাজা তরুণ ঝরে গেছে, মায়ের বুক খালি করে চলে গেছে কত যুবক সন্তান। তবু কবি সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখেন, লড়াই করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেন, সুস্থ স্বদেশ গড়ে তুলতে চান—

উষা ও সবিতা
উদয় আর অস্তের মাঝখানে
রক্ততটের ওপর দিয়ে
পায়ের চিহ্ন আঁকতে আঁকতে
আজও হেঁটে চলেছি আমরা,
আমাদের চলার সমতালে
ঐ দুলে দুলে উঠছে
আমাদের কাঁধের পরিশ্রমী কুঠার।' (রক্ততট)

এ কুঠার স্রষ্টার, এ কুঠার শিল্পীর। এই কুঠার দিয়েই শিল্পী সমাজের আবর্জনাকে ধ্বংস করবেন। 'রক্ততট' কবিতাতে সেই দায়বদ্ধতদার কথাই ঘোষণা করেছেন—

'পূর্ব আর উত্তরপুরুষের মাঝখানে
আমরাই তো সেতুবন্ধ।
মা-কে বৈতরণী পেরিয়ে পিতৃলোক
সন্তানকে উজ্জীবনের নদী ডিঙিয়ে ভুবনডাঙা
দেখানোর দায় তো আমাদেরই।'

সেই দায় নিয়েই কবি বেঁচে থাকতে চেয়েছেন।

Scanned with CamScanner

মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়

—জয় গোস্বামী (১৯৫৪-)

■ **উৎস ঃ** কবিতাটি 'আজ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো' (১৯১১) কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা। 'প্রেমের কবিতা' (২০০৩) সংকলন গ্রন্থেও কবিতাটি স্থান পেয়েছে।

বিষয়বস্তু

■ একটি কালো কিশোরী মেয়ে তার নিজের মুখে তার ব্যর্থ প্রেমজীবনের কাহিনি শুনিয়েছে। তার প্রথম প্রেমের বেণী অর্থাৎ বাঁশি যে বাজিয়েছে, সেই বেণীমাধবকে উদ্দেশ্য করেই কালো

Scanned with CamScanner

সেই তরুণী তার জীবনের দুঃখের কথা বলে গেছে। একদিন সে বেণীমাধবকে বলেছিল যে, সে তার বাড়ি যাবে। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। মেয়েটি জানতে চেয়েছে, বেণীমাধব আর তার কথা ভাবে কিনা। তমাল তরুমূলে একদিন বেণীমাধব অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রেমের বাঁশি বাজিয়েছিলেন। আর মেয়েটি সেদিন কৃষ্ণ বেণীমাধবের প্রেমের বাঁশি মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট ক্লাসঘরের ডেস্কে বসে অঙ্ক করতে করতে তা শুনেছিল, শ্রেণিকক্ষের বাইরে দিদিমণি তার বরের পাশে বসেছিল। মেয়েটি তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। সে তখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে সবে। বান্ধবী সুলেখাদের বাড়িতেই তার সঙ্গে আলাপ হল বেণীমাধবের। আর সেখান থেকেই তার মনে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়।

পূর্বরাগের পর অনুরাগ। বেণীমাধব ছিল লেখাপড়ায় ভালো। শহর থেকে সে বেড়াতে এসেছিল গ্রামে। মেয়েটি ছিল কালো। বেণীমাধবকে দেখে লজ্জায় এক দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল ঘরে। তার বাবা সামান্য এক দোকানে কাজ করতো। তাদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। তাই তার শঙ্কা ও লজ্জা। কিন্তু প্রেম যে লজ্জা ও শঙ্কা, কোনো কিছুতেই বেঁধে রাখা যায় না। প্রেমের বনে মুকুল যখন ফোটে, ভ্রমর যে তখন গুনগুনিয়ে ওঠে। তখন প্রিয়তম ছাড়া কোনো কিছুই আর ভালো লাগে না। সন্ধেবেলা পড়তে বসে একের পর এক অঙ্ক ভুল করে চলে। নবম শ্রেণিতে ষোলো বছরের সেই তরুণীর পক্ষে প্রেমের রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিকে অবহেলা করা সম্ভব হয় না। তখন প্রিয়তমাকে দেখার মধ্যে কী সুখ! ব্রীজের ধারে লুকিয়ে দেখে বেণীমাধবকে।

অনুরাগের পর আপেক্ষানুরাগ। অনেকদিন কেটে গেছে। শহরের ছেলে বেণীমাধব শহরে ফিরে গেছে। মেয়েটি কিন্তু তার প্রথম প্রেমের ফুলকে যত্ন করে বুকে ধরে রেখেছে। বেণীমাধবের কাছে মেয়েটি জানতে চেয়েছে, সত্যি করে বেণীমাধব যেন তাকে বলে, পুরোনো সেইসব স্মৃতি তার কি এখনও মনে পড়ে না? বেণীমাধব কি তার প্রেমিকাকে সেইসব কথা বলেছে? মেয়েটি কেবল একটি দিন আলোর নীচে বেণীমাধবের পাশে তার প্রেমিকাকে দেখেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ে তালগোল পাকিয়ে গেল সব। মেয়েটির স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ওদের দু'জনকে ভালো মানিয়েছিল। ওদের দেখে একদিকে তার চোখ যেমন জুড়িয়েছিল, তেমনই আবার মনের জ্বালায় চোখের পাতা ভিজেও গিয়েছিল। বুক ভরা আক্ষেপ আর ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে বলেছিল, ওরা ভালো থাকুক, সুখে থাকুক।

আক্ষেপানুরাগের পর বিরহ। বৈষ্ণব কবিদের মতো প্রেমের সবকটি অবস্থাই এ কবিতায় ধরা পড়েছে। মেয়েটি এখন রাতে একা একতলার ঘরে ঘুমোতে যায়। মেঝের উপর বিছানা পাতা থাকে। বিছানার উপর জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়ে। তার যে ছোটোবোন ছিল সে যৌবনের উন্মাদনায় তাদের ছেড়ে কোথায় কার সঙ্গে চলে গেছে। তার বোনের ঠিকানা এখন সে জানে না। বোনটি তার এখন হয়তো সুখে আছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সুখে থাকবে কিনা জানে না। তার কালো ঘরে অমঙ্গলের দেবতা শনি বিরাজ করছে। সে এখন এই পাড়ার সেলাই দিদিমণি হয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করছে। প্রথম প্রণয়ের স্মৃতিকে ভুলতে পারছে না কিছুতেই। বেণীমাধবকে উদ্দেশ্য করে বলছে, প্রতিশোধের আগুনে সেও যদি এমনইভাবে ধ্বংস হয়ে যায়? বোনের মতো সেও যদি নষ্ট মেয়ে হয়ে যায়, তবে বেণীমাধব কি দুঃখ পাবে না?

Scanned with CamScanner

❑ কবিতার উৎস ঃ

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাদেবের দুয়ার' কাব্যটি ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। 'আমার ভারতবর্ষ' কবিতাটি ঐ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

❑ কবিতার নামকরণ ঃ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন বাস্তববাদী কবি। কোনো রোমান্টিক স্বপ্নালুতা নেই তাঁর চোখে। কঠোর বাস্তবের চিত্র রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। 'আমার ভারতবর্ষ' কবিতায় কবি ভারতবর্ষের অতি বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

ভারতবর্ষের মানুষরা বড় কষ্টে ও দুঃখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তারা কঠোর পরিশ্রম করেও ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করতে পারে না। শাসক শক্তি তার হিংসা-কুটিল নিঃশ্বাসে সমগ্র দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত করে তোলে। তাদের লোভ ও ষড়যন্ত্রের ফলে দেশে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। সাধারণ মানুষ তার ফলে বড় বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এরকম দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্যেও ভারতবর্ষের মানুষ বেঁচে থাকে। ক্ষুধার জ্বালা, শীতের কষ্ট ও নানা যন্ত্রণা সহ্য করেও এরা সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। ভারতবর্ষের মানুষের জীবনধারার রূপ এই কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে বলে, কবিতার 'আমার ভারতবর্ষ' নামকরণ সার্থক হয়েছে বলা যায়।

❑ কবিতার বিষয়বস্তু ঃ

কবিতাটিতে ভারতবর্ষের মানুষের হতশ্রী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষের জীবন দুঃখ ও দারিদ্র্যে পূর্ণ। সারাদিন রৌদ্র-মাথায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও তারা ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতে পারে না এবং পরিধানের বস্ত্রও জোগাড় করতে পারে না। ক্ষুধাজীর্ণ শরীরে উপযুক্ত বস্ত্রের অভাবে শীতের রাতে তারা না পারে ঘুমাতে।

এই ভারতবর্ষে একের পর এক শাসকের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা ঈর্ষা ও দ্বেষ ছড়িয়ে দিয়েছে নানা দিকে। ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে তারা সুবিধা ভোগ করতে চেয়েছে। লোভীরা তাদের প্রাপ্য আদায় করে নেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। চারিদিকে এমনি দুর্যোগময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

আবার এই ভারতবর্ষে নেমে এসেছে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের অভিশাপ, চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে তার করাল রূপ। তার ফলে এখানকার মানুষ আরও বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

নানা দুর্যোগের মধ্যে দাঁড়িয়েও ভারতবর্ষ আপন মহিমায় স্থিত, অটল ও আবেগহীন। তার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালা ও শীতের আঘাত সহ্য করেও বেঁচে থাকতে চায় এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের আনুগত্যও বজায় রাখতে চায়।

❑ শব্দার্থ ও টীকা ভাষ্য ❑

নগ্ন মানুষ—ভারতের মানুষের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এখানকার অধিকাংশ মানুষ ভালো পোশাক পরতে পারে না। কোনো রকমে লজ্জা নিবারণ করার মতো বস্ত্র তারা জোগাড় করতে পারে। কবি ভারতের অধিকাংশ মানুষকে নগ্ন মানুষ বলে খেদোক্তি করেছেন।

ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে—এখানকার মানুষের দীন-দরিদ্র অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এরা সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করতে পারে না। শীতের সময় তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। উপযুক্ত বস্ত্রের অভাবে তারা শীতের রাতে ঘুমাতে পারে না।

কত রাজা আসে যায়—দেশের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে শাসকের পরিবর্তনে। ভারতের শাসনদণ্ড বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শক্তির উপর অর্পিত হয়েছে। অতীতকাল থেকে বিভিন্ন বলদর্পী জাতি ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে এবং এখানে তাদের রাজ্য-বিস্তার করেছে। এমনিভাবে শক, হুন, পাঠান, মোগল ও ইংরেজ জাতি এদেশে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করেছে।

বাতাস ধোঁয়ায় অন্ধকার—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসনব্যবস্থায় দেশের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ ছড়িয়েছে। মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতি তাতে নষ্ট হয়ে গেছে। শান্তির পরিবেশ এভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

চারিদিকে ষড়যন্ত্র—সাধারণ মানুষ আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। তার মনে একটা ঈর্ষাকুটিল মনোভাব সৃষ্টি

Scanned with CamScanner

হয়ে চলে। তাই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অন্যদের বিপন্ন করে তুলবার জন্য একশ্রেণির মানুষ সব সময় চেষ্টা করতে থাকে।

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ—দুটি অবস্থাই যে-কোনো শান্তিপ্রিয় দেশের পক্ষে ভয়ঙ্কর। এখানে সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪২)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতবর্ষ এ যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ শক্তি এ যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ভারতবর্ষও তার ফলভোগ করতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধের পরেই ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ বিপুলাকারে দেখা দেয়, তাতে বহু মানুষ অনাহারে ও রোগে মারা যায়।

ভারতবর্ষ চেনে না তাদের ঃ ভারতবর্ষের বুকে যুগে যুগে বিভিন্ন রাজশক্তি শাসন করে গেছে। শক-হূন-পাঠান-মোগল-ইংরেজ তাদের নিজ নিজ ক্ষমতাদর্প ও শোষণপ্রক্রিয়া কায়েম করে গেছে। স্বাধীন ভারতেও শাসনক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছে। এইসব রাজন্যবর্গ বা শাসকগোষ্ঠী যত ক্ষমতাবান বা শক্তিশালীই হোক, কবির স্বদেশচেতনা ভারতের ইতিহাসে, তার সভ্যতা নির্মাণের পিছনে এইসব উচ্চবিত্ত রাজশক্তির ভূমিকাকে স্বীকার করে না।

আজও ঈশ্বরের শিশু—দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী চল্লিশ কোটি নিরন্ন, নগ্ন শ্রমজীবী মানুষকেই কবি ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তারা যুগ যুগ ধরে শাসকবর্গের শোষণ-অত্যাচার এবং শত-সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। এই পশুর মতো শুধু টিকে থাকার মধ্যে কোনো মানবিক মহত্ত্ব নেই। কিন্তু এই সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে দেখেছেন এক অপরাজেয় শক্তি। যা শত প্রহারেও ঈশ্বরের মতোই মৃত্যুঞ্জয়। এই মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির জন্যই তারা 'ঈশ্বরের শিশু' বলে অভিহিত।

পরস্পরের সহোদর—এই শব্দবন্ধের মধ্যে দিয়ে কবির বামপন্থী চিন্তাই প্রতিফলিত। ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি সর্বহারা কেবল শোষিত মানুষ হিসাবেই এক শ্রেণিভুক্ত। তাই জাতিধর্ম নির্বিশেষে তারা সর্বহারা পরিচয়েই পরস্পরের সহোদর।

☐ কবিতার রসগ্রাহী আলোচনা ঃ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও একজন বাস্তববাদী কবি। প্রখর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেন। সমাজে মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার ছবি তিনি তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন এবং শেষ পর্যন্ত মানুষকে সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসবার জন্য তিনি উদ্বুদ্ধ করেন।

'আমার ভারতবর্ষ' কবিতায় কবির একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখানকার মানুষেরা অতি কষ্টে জীবন-যাপন করে চলেছে, তারা হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করেও দু-বেলা দু-মুঠো খাবার পেট ভরে খেতে পায় না—

"যারা সারা দিন রৌদ্রে খাটে, সারা রাত ঘুমুতে পারে না
ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে।"

এই ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে কত শাসকবর্গের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু কেউ কোনো সদিচ্ছা নিয়ে এখানে রাজত্ব করতে আসেনি। সকলের মনেই একটা ঈর্ষা-কুটিল ভাবনা কাজ করে চলেছে। ক্ষমতার মদগর্বে শাসকশ্রেণি সমস্ত দেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, আবার লোভের বশে সে সমগ্র দেশবাসীকে শোষণ করে চলেছে। এভাবে তারা সারা দেশের আবহাওয়া কলুষিত করে তুলেছে। শাসকশ্রেণির এই চরিত্র-পরিচয় চিরকাল একইভাবে চলে এসেছে। শঠতা, ষড়যন্ত্র ও বিভেদকামিতাকে অবলম্বন করে শাসকশ্রেণি সমগ্র দেশের শান্তি বিঘ্নিত করে চলেছে।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে খুবই সচেতন। কত অসহায় শান্তিপ্রিয় মানুষকে তিনি যুদ্ধবাজদের হাতের ক্রীড়নক রূপে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছেন। কবি যৌবন-প্রারম্ভে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ দেখেছেন, বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীর জীবনে তার চরম প্রতিক্রিয়ার রূপও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন—

"যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আসে পরস্পরের মুখে চুমু খেতে খেতে
মাটি কাঁপে সাপের ছোবলে, বাঘের থাবায়।"

তিনি দেখেছেন বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার-অবিচারের ভয়াবহ রূপ, তিনি দেখেছেন ধনতান্ত্রিক

Scanned with CamScanner

ব্যক্তিগোষ্ঠীর মদতে তৈরি নানা শোষণ ক্রিয়া। তাই তাঁর মনে হয়েছে, আর যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এই রূপটি একতম রূপ নয়। ভারতবর্ষের মধ্যে রয়েছে এক অযুত প্রাণশক্তি। তাই নানা আঘাত-সংঘাতেও ভারতবর্ষ এখনও টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে। ভারতবর্ষে অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের রূপ বিদ্যমান থাকলেও সে বাহ্যিক কোনো শক্তির কাছে পরাভব স্বীকার করতে চায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভারতবর্ষ আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি খুঁজে পায়। কোনো আঘাতে সে ভীত বা সন্ত্রস্ত নয়—

"আমার ভারতবর্ষ চেনে না তাদের
মানে না তাদের পরোয়ানা।"

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ কবিতায় ভারতবর্ষের বাস্তব দুঃখময় চিত্রের বর্ণনা দিলেও, ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান করতে সমর্থ হয়েছেন। এখানকার মানুষের এক দুর্বার সহনশীল শক্তির পরিচয় তিনি অবারিতভাবে প্রকাশ করেছেন। এখানে কবিতাটিতে একটি ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এ কবিতায় কবি-স্বভাবের কিছু স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শুধু বিক্ষোভ বা বিরোধ নয়, এখানে ভারতবর্ষের এক মহত্তম রূপ উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'আমার ভারতবর্ষ' একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা, এখানে কোনো আলংকারিক ভাষার আতিশয্য নেই। সহজ সরল ভঙ্গিতে সাবলীল ভাষায় কবি-প্রাণের এক বাস্তব ও মহনীয় ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। শব্দ ব্যবহারে কবি খুবই যত্নশীল ছিলেন, তাই কবিতার ভাষা সহজেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে।

কবি সাধারণত ধ্বনি প্রধান ছন্দেই কবিতা রচনায় স্বাভাবিকতা বোধ করেন। বর্তমান কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, তবে নিয়মের ক্ষেত্রে অবশ্যই ত্রুটি রয়েছে। আসলে কবি এ ব্যাপারে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম মেনে চলতে চাননি। কবিতায় ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রকাশকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। সেদিক দিয়ে কবির ভাব যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

কবি এ কবিতায় একটি বাস্তব দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছেন। সেখানে তিনি ভারতবর্ষের নানা দুঃখময় চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু কবিতাটিতে শেষ স্তবকে ভারতবর্ষের এক অন্তর্লীন মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে, যা কবিতাটিকে মহত্তম উত্তুঙ্গতায় তুলে ধরেছে। সহজ সরল ভাষায় কবির অনুসৃত ভাবটি প্রকাশিত হওয়ায় তা যেমন সুখপাঠ্য হয়েছে, তেমনি সাধারণ পাঠকের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

Scanned with CamScanner

'সংগতি' কবিতাটি অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবিতাটির ভাববস্তুর মধ্যে কবি-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে যা সমকালীন কবিদের ভাবসাযুজ্য বজায় রেখেও বিশিষ্টতায় দীপ্ত হয়ে আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বারুদগন্ধ বাতাস থেকে মুছে যাবার আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। কবির চোখে ধরা পড়ে মানুষের আপন হাতে কবর-খোঁড়ার দৃশ্য। টি. এস. এলিয়টের মতো অমিয় চক্রবর্তীও গোটা পৃথিবীকে 'ওয়েস্ট ল্যান্ডে' পরিণত হতে দেখেছেন। মানবজীবনের পুরনো মূল্যবোধ ততদিনে বিপর্যস্ত। শক্তিমান অস্ত্রধর জাতিসমূহের পৈশাচিক আচরণে পৃথিবীর সাধারণ মানুষেরা দিশেহারা, আত্মপ্রত্যয়হীন এবং জীবনের সকল আদর্শের প্রতি আস্থাহীন। রাজনীতি ও সমাজনীতির জটিল স্রোতের আঘাতে মানবজাতি তখন স্পষ্টতই স্বতন্ত্র তটভূমিতে ভাগ হয়ে গিয়েছে—একদল বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে ধ্বজা তুলে সুবিধা ভোগে তৎপর, বৈষয়িক সুখে আত্মতৃপ্ত অথবা ক্রমবর্ধমান লালসায় উল্লসিত। জীবনের রংবাহারী ভোগ-উৎসবে তারা এমনই মগ্ন যে মানবজাতির বাকি অর্ধাংশের প্রতি উদাসীন, নির্মম অপর দল দুর্ভাগ্যপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, আশাহত মূঢ়তায় নিমজ্জিত—এমনকি প্রতিবাদ করার মুহূর্তেও প্রতাপের চাপে তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ। ফলে তারা 'চলন্ত শবদেহে' পরিণত।

এরকম দুঃসহ পরিস্থিতিতে কোনো সচেতন কবির পক্ষেই নীরব আত্মরতিতে নিমগ্ন থাকা সম্ভব নয়। ফলে বাংলা সাহিত্যের দিকে দিকে আধুনিক কবিদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষিত হতে লাগল। তখন থেকেই মানবসমাজ সম্পর্কে সচেতনতা বাংলা কবিতার বিশিষ্ট ভাববস্তুরূপে গৃহীত হল। সেই যুগমানসেই লালিত হয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর কবি-মন। 'সংগতি' কবিতাটি সেই যুগ-যন্ত্রণারই অভিব্যক্তি। কবি-হৃদয়ে পুঞ্জিত রয়েছে মানবজীবনের বিবিধ অপচয়ের গ্লানি, বাস্তব দুঃখ-যন্ত্রণার তীব্র দাহ। সভ্যতার সূর্য যখন পৃথিবীর অতল-কেন্দ্র পর্যন্ত আলোকিত করছে বলে একদল মানুষে ঘোষণা করে চলেছে, ঠিক তখনি কবি বিস্মিত হয়ে দেখলেন 'দুপুর ছায়ায় ঢাকা'। দেখলেন—

> "আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
> মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,
> বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
> প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—

বিশ্বব্যাপী ভুখা-মিছিলের ক্রন্দন কবি শুনেছেন। 'ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম' তাঁর দৃষ্টি থেকে রোমান্টিক ভাবাবেশ কেড়ে নিয়েছে, 'প্রাণ নেই তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা'-র প্রাণান্তকর অসহায়তা। তাঁর মনকে তীক্ষ্ণ বেদনায় আহত করে তুলেছে। এই সময়-সচেতন মানবমুখীনতার মধ্যেই অমিয় চক্রবর্তীর কবি-ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট ধরা পড়েছে। কবি যে পীড়িত মানবাত্মার নিত্য সহচর সে কথা আলোচ্য কবিতায় স্পষ্ট। ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ যে কী নিদারুণ দুঃসহ তা তিনি নিজ অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, তাই হতভাগ্য মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কখনো তিনি অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে বলেছেন, 'সঙ্গী হারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা/পাখায় কেন যে নানা রঙ তার আঁকা।' আবার কখনো তথাকথিত সভ্য মানবগোষ্ঠীর নির্মমতাকে আঘাত করেছেন বিদ্রূপাত্মক রুক্ষবচনে—

Scanned with CamScanner

"মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায়ে ধুলো,
যারা সরে যায় তারা শুধু—লোকগুলো;
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,"

মোট কথা, মানবজন্ম নিয়েও যারা মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত; 'যারা সবই থেকে নাহি পায়'—সেই দুর্গত জনগোষ্ঠীর প্রতিই কবির সহানুভূতি।

কবিতাটিতে কবির একটা বিশ্বাস ধ্রুবপদের মতো ঘুরেফিরে এসেছে 'মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।' মনুষ্যকৃত, প্রকৃতিকৃত যাবতীয় অসংগতি দূর করতে দেবতা ঝাঁটা হাতে নিয়েছেন। এই ঈশ্বর নির্ভরতা কবিতাটিতে স্পষ্ট।

কবিতাটির ভাষা ও ভঙ্গি সংযত, হৃদয়গ্রাহী। পদ্যকে ব্যবহার্য গদ্যের কাছাকাছি এনেছেন। লৌকিক শব্দ ও বাকভঙ্গির অনায়াস ব্যবহার শুনে আমরা চমকিত হই। কবিতার কয়েকটি চিত্রকল্প চিত্তাকর্ষক হয়েছে। দুর্বিপাকের মধ্যে পড়ে আত্মরক্ষার অসহায় চেষ্টাকে 'ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার ঐ ভাঙা দরজাটা'-র চিত্রকল্পে সভ্যতাগর্বী সুবিধাভোগী স্বার্থান্ধ মানুষের চেহারা এঁকেছেন। 'মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো', 'মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা' অবিস্মরণীয়। 'বন্যার জল, তবু ঝরে জল', 'জীবন, জীবন-মোহ', 'তারা শুধু—লোকগুলো'—বাক্যাংশ বিবরণের বিস্তারকে সংহত করার নিজস্ব ভঙ্গির চমৎকার ব্যবহার ঘটেছে। 'মেলাবেন, তিনি মেলাবেন' ধ্রুবপদের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার শেষে 'তিনি' যে 'দেবতা' এ কথা ঘোষণা করে নাট্যরসের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং, ভাব ও রূপ সচেতন কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'সংগতি' সকল দিক থেকেই সার্থক হয়ে উঠেছে।

❑ **সারসংক্ষেপ :**

জগৎ ও জীবনের সমস্ত অসংগতি, পরিস্থিতি, চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যেকার ব্যবধান দূর করে দেবেন পরম-পুরুষ ভগবান। মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে দুঃখের তুফান উঠছে প্রতিনিয়ত, আর মানুষ সেই দুঃখকে বাধা দিয়ে অসহায়ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে সারাক্ষণ। মানুষের এই দুঃখ জয়ের করুণ চেষ্টা এবং দুঃখের নিত্য প্রসারের মধ্যবর্তী অমিলটাকে দূর করবেন ঈশ্বর। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মানুষ আপন শক্তিবলে অতিক্রম করতে পারে না। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে মানুষের বুকভাঙা হাহাকার প্রকাশ ছাড়া আর উপায় নেই। কবির বিশ্বাস স্বয়ং ঈশ্বরই কেবল পারেন জগৎ ও জীবনের এই কঠিন দুঃখ মোচন করতে।

প্রকৃতপক্ষে চরাচরের কোথাও কোনো অসংগতি নেই বলে কবি মনে করেন। একদিকে চলেছে সভ্যতার সৌধ নির্মাণে মানবশক্তির প্রবল প্রকাশ—তার শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতির নিত্য প্রসার—তার কত কীর্তি, কত বিফলতা এবং খ্যাতি-অখ্যাতি। অন্যদিকে সেই মানবজাতিরই একটা বৃহৎ অংশ সভ্যতার প্রসাদকণা থেকে বঞ্চিত। এমনকি তাদের বেঁচে থাকার আয়োজনটুকুও নেই। জঠরের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে না পারার যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণার পরিণামে অবধারিত জীবননাশ এই হচ্ছে তাদের অনিবার্য নিয়তি। আলো এবং অন্ধকারের এই প্রভেদটুকু অর্থাৎ অসংগতিটাও একদিন ভগবান মোচন করে দেবেন।

মানব-সংসারের দুটি পরস্পর বিরোধী চিত্র খুবই স্পষ্ট। একদল মানুষ জীবনকে আশাতীত সুখে-সম্পদে ভরে তুলতে পারছে। তারা জীবনের বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যকে যেন সহজাত অধিকারের মতো পেয়েছে—তাই জীবন সম্ভোগের মোহ তাদের দেহমনকে আনন্দ-শিহরণে উন্মুখ করে তোলে। অপরদল মানুষের সুখস্বপ্ন আছে বটে কিন্তু সেই স্বপ্নকে চরিতার্থ করার উপায় বা অধিকার নেই। দুর্ভাগ্য-পীড়িত সেইসব মানুষের সম্বল নির্বাক মনের প্রচণ্ড অথচ গোপন বিক্ষোভ। কবি জানেন এই

Scanned with CamScanner

মন্ত্রণাকাতর অবস্থাতেও মানুষ পূর্ণতার এবং সাফল্যের স্বপ্ন দেখে, প্রাণের কোনো ধর্মই যেখানে প্রকাশের পথ পায় না সেখানেও বেঁচে থাকার সাধ করুণভাবে টিকে থাকে। ভগবৎসৃষ্ট পৃথিবীতে মানবজীবনের এহেন সুর-বেসুরের সংগতিহীন লীলা অনন্তকাল ধরে চলেছে। কবির দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানই পারবেন ধনী-দরিদ্রের, বিজয়ী-পরাজিতের যাবতীয় প্রভেদ দূর করে সংগতি রচনা করতে।

বিত্তবান আর ভূরিভোজীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈজ্ঞানিক সত্যের এবং সেই সঙ্গে জাগতিক আরাম-বিলাসের প্রসার ঘটছে প্রতিদিন। কিন্তু সেই সভ্যতার যূপকাষ্ঠে যে অসংখ্য প্রাণ বলি হচ্ছে সেই অযূত মানবগোষ্ঠীর ইতিহাস কেউ মনে রাখছে না। দরিদ্র, যন্ত্রণাক্লিষ্ট, শক্তিহীন অসহায় সেই মানুষগুলির অন্তর থেকে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটে—মানুষ হয়ে জন্মলাভ করেও কেন মানবাধিকার থেকে তারা বঞ্চিত এই সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর তখন সভ্যসমাজ দিতে পারে না। বিত্তবানের দল এবং সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী আত্মরক্ষা করে লাভের অংশ বাড়াবার মতলবে পাপ-পুণ্যের কথা টেনে আনে। অকারণে সমাজের অনুশাসনকে দুর্বহ করে তুলে ধর্মাধর্মের ভয় দেখিয়ে কার্য সিদ্ধি করে।

কবি ঐকান্তিক বিশ্বাস, জগৎ ও জীবনের এই সমস্ত অসংগতি গ্লানি, অসাম্যের যন্ত্রণা এবং যুগবাহিত বঞ্চনাকে ভগবান তাঁর ন্যায়দণ্ডের সম্মার্জনীর আঘাতে এক নিমেষে দূর করে দেবেন।

উৎস : 'সংগতি' কবিতাটি অমিয় চক্রবর্তীর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'অভিযান বসন্ত' থেকে গৃহীত।

Scanned with CamScanner

—বিষ্ণু দে

❑ কবি-পরিচিতি :

বিষ্ণু দে'র জন্ম ১৮ই জুলাই ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার পটলডাঙ্গায়, কিন্তু কবির পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল হাওড়ায়। ছোটোবেলা থেকে তিনি বিশেষ শিক্ষানুরাগী ছিলেন। একজন ভালো ছাত্র হিসাবে তিনি একের পর এক স্কুল-কলেজের গণ্ডি অতিক্রম করে অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ পাস করেন। এর পর শুরু হয় তাঁর অধ্যাপনা জীবন। প্রথমে রিপন কলেজ, পরে প্রেসিডেন্সি, ইসলামিয়া বা মৌলানা আজাদ প্রভৃতি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। এই অধ্যাপনার পাশাপাশি শুরু হয় কাব্যচর্চা, মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত শিক্ষকতা ও কাব্যচর্চাই ছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান।

❑ রচনাসমূহ :

সংখ্যাতীত রচনাসমূহের সৌজন্যে কবি বিষ্ণু দে আধুনিক কবিদের মধ্যে যেমন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন তেমনি রচনা রীতির সৌকর্যে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে 'আকাদেমি পুরস্কার' ও ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' এবং 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কারে' ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর বিভিন্ন প্রতিনিধি স্থানীয় কাব্যগ্রন্থ, যেমন—'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩৩), 'চোরাবালি' (১৯৩৭), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৫), 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭)। 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৩৬০) প্রভৃতি রচনার সাথে বিভিন্ন কবিতা সংকলন গ্রন্থও তিনি প্রকাশ করেন। এছাড়া বিভিন্ন বাংলা প্রবন্ধ গ্রন্থ, যেমন—'রুচি ও প্রগতি' (১৯৪৬), 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৯৫২), 'এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য' (১৯৫৮) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তা চেতনা ও মনন বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আবার ইংরেজি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনায়ও তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। যামিনী রায়, নীরদ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ মনীষীদের উদ্দেশ্যে রচিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, শুধু তাই নয় একই সাথে সাথে বিষ্ণু দে অনুবাদ সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করে তাঁর অপরিসীম প্রতিভার আর এক দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। 'জন্মিলে মরিতে হবে' এই সার সত্য প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রে সার সত্য। কবি বিষ্ণু দে এর ব্যতিক্রম নয়। তাই মহাকালের অমোঘ নির্দেশে করাল মৃত্যুর হাতছানিতে দুরন্ত প্রতিভার ঘোড়া থামতে বাধ্য হয়েছিল। অবশেষে তাঁর অমূল্য সৃষ্টিকর্ম ও অসংখ্য পরিবার পরিজনকে পিছনে ফেলে সুদীর্ঘ কর্মজীবনকে বিদায় জানিয়ে ৭৩ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

❑ উৎস নির্দেশ :

১৩৫৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'সাহিত্য পত্র' পত্রিকায় কবি বিষ্ণু দে'র 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ' কবিতাটি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। পরবর্তী সময়ে কবিতাটি 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৩) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের একাদশ সংখ্যক কবিতা।

❑ রচনাকাল :

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কবি বিষ্ণু দে'র সপ্তম কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের কবিতাগুলি ১৯৪৬-৫৩-র সময়সীমার মধ্যে লেখা। এই কাব্যের প্রথম কবিতাটি হল '২২শে শ্রাবণ' ও শেষ কবিতাটির নাম '২৫শে বৈশাখ'। আলোচ্য কালপর্বটি বাঙালি তথা ভারতবাসীর জীবনের বিশেষ তাৎপর্যবাহী। মূলতঃ এটিকে পঞ্চাশের দশক হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, বিশ্বজোড়া কমিউনিস্ট

Scanned with CamScanner

ভাবধারা এই সময় থেকে তরুণ বাঙালিদের মনকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল। বিষ্ণু দেও এই ভাবধারার অংশীভূত। তবে এই ভাবধারাকে তিনি বেশিদিন অবলম্বন করে চলতে না পারলে স্বদেশ সংক্রান্ত এক প্রচ্ছন্ন অভিমান মনে মনে পোষণ করতে শুরু করেছিল। যার বহিঃপ্রকাশ তাঁর এই 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ' কবিতাটি। তবে কাব্যগ্রন্থটিতে তাঁর স্বদেশ প্রেম বিশেষভাবে বিদ্যমান।

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যটির মূল ভাব ঃ নদী, চর সমুদ্রের প্রতিচ্ছবি ও ধ্বনী চিত্র বিশেষ তাৎপর্যসহ উপস্থিত কবি বিষ্ণু দে'র—'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থে। কাব্যের প্রতিটি কবিতার মধ্যে দিয়ে যে ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা হল— 'ভাঙা ও গড়ার, জীবন ও মৃত্যুর এক দ্বন্দ্বময় পরিণামের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্বহীন সঙ্গীতের সৃষ্টিশীল পরিণতিতে কবি উপনীত হতে চেয়েছেন। অন্তহীন জলতরঙ্গের মত একটানা বেজে চলে কবির এক বিরামহীন চলার নেশা। সমগ্র কাব্যটি জুড়ে অন্তরঙ্গে বহিরঙ্গে সঙ্গীতের মেজাজ সঞ্চারিত হয়েছে। কবির ধারণা সঙ্গীত বা কবিতা জীবনের মতো, নিসর্গের মতো দ্বন্দ্বের প্রতীক মাত্র। তবে সঙ্গীতের সুরের রোমান্টিকতার সঙ্গে কবির স্বদেশ অন্বেষাও অপরিতৃপ্ত থাকেনা। ধরা পড়ে তাঁর কাল-দেশ-সমাজ-ইতিহাস সচেতন মনও।

❑ আলোচ্য কবিতার সারমর্ম :

স্বদেশ কবিচেতনায় দীর্ঘকাল উপস্থিত। বহুদিন ধরে তিনি তাঁকে চেয়েছেন, তাঁকে সারাক্ষণ খুঁজে বেড়িয়েছেন। কখনো পাশ দিয়ে, কখনো আড়াল দিয়ে, কখনো দেশান্তরে। কখনো চোখাচোখি হয়, কখনো কানে কানে কাছাকাছি ডাকে। কিন্তু আজও পর্যন্ত কবি তাঁর সেই অন্বিষ্ট স্বদেশকে খুঁজে পাননি। তাঁর কাঙ্খিত স্বদেশ কেবল অধরাই থেকে গেছে। বাহুর নাগালে একবারের জন্য ধরা পড়েনি। অথচ এই স্বদেশ সূর্যের মতো প্রত্যক্ষ, ফসলের কাছে মৃত্তিকার মতো; পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রত্যক্ষ, জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে তার ধ্বনি প্রবাহিত। উত্তরাধিকারেও স্বদেশের প্রেরণা অনুপস্থিত নন। তবুও কবি তাঁকে সারাক্ষণ খুঁজে বেড়ায়। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনতায় 'দুর্গতির ব্যাপ্ত দায়ভাগে' জনসাধারণের আপনাপন কর্মের প্রবাহে কবি প্রতিনিয়ত স্বদেশকে খুঁজে বেড়ান। মনে হয় এই বুঝি স্বদেশের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সমুদ্রের আবেগ কল্লোলে এই বুঝি তার আবির্ভাব ঘটল। মানব জীবনের উল্লাসে, পথের প্রদীপ্ত মিলিত ভাষায়, সভায় মিছিলে জনতার ভিঁড়ে, কবি স্বদেশকে খুঁজে বেড়ান। আবার কখনো স্বদেশ মেঘে-বজ্রে-বিদ্যুতে, মোহনার ভাঁটায়, অশ্রুহীন হঠাৎ সন্তাপে ছায়া রেখে যায়। চতুর্দিকে শুধু হাতিয়ার রেশ, কবি সেই ছায়া ও হাওয়াকে প্রতিনিয়ত অন্বেষণ করেন, কখনো বা স্বদেশ তালতমালের বনে, কখনো বা মৃত্যুর বাঁধা রাজপথে, মানুষের সামনে আড়ালে কবির অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত স্বদেশকে খুঁজে বেড়ান। তবুও যে আসন্ন—তবুও সে 'দুরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী'—তাই কবির কাছে স্বদেশ এখনো প্রচ্ছন্ন।

Scanned with CamScanner